জুয়েল খান

৫ সেপ্টেম্বর ২০২২

আমার নাম মোহাম্মদ জুয়েল খান, জন্ম ১৯৭৮ সালের ১০ মার্চ, বাংলাদেশে। আমার বাবা-মা বাংলাদেশের বাসিন্দা। আমি এদেশে আসবার পর তাঁরা এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁদের অনেক জায়গা ঘুরে দেখিয়েছি, তাঁদের ভালো লেগেছে। আমার বাবা হাজী মোহাম্মদ লোকমান খান ভুষিমাল ও মনোহারী পণ্যের নামকরা ব্যবসায়ী। তিনি গল্প করতেন, তিনি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়েন, সেসময় থেকে তিনি পড়ালেখার পাশাপাশি ব্যবসা শুরু করেন। আমার যখন ১০-১১ বছর বয়স, তখন তিনি আমাকে দিয়ে ব্যবসা শুরু করান। একদিকে লেখাপড়া করতাম, আরেকদিকে দোকানে কাঠের দুমুখো হাতলওয়ালা চেয়ারে বসতাম। কাস্টমাররা অবাক হয়ে বলতো—এইটুকু ছেলে, কেমন করে সে দোকান চালাবে? আমার বাবা বলতেন—আমিও ওরকম বয়স থেকেই শুরু করেছি। আমি বাবাকে সাহস দিয়ে বললাম, আমি তাঁর দোকান চালিয়ে নিতে পারব। আমার ১৫-১৬ বছর বয়সে আমার দাদা বললেন, আমি তাঁর আদরের একমাত্র নাতি, আমার বাবা যেন আমাকে দোকানদারির পথে না নেন। আমি অনুনয় করে বললাম, আমাকে যেন তবু একটা সুযোগ দেয়া হয়, আমি ব্যবসা করতে পারব। বাবা আমাকে সেই সুযোগ দিলেন, তিনি ধীরে ধীরে দোকানে বসা কমিয়ে দিলেন, আমিই দোকানটা চালাতাম। খদ্দেরদের বেশি বেশি বাকিতে দিতে বাবা নিষেধ করতেন, বলতেন আমি যেন বিপদে পড়া লোককে মাঝে মাঝে বাকিতে দিই, কিন্তু যেন খেয়াল রাখি যে তারা তা ফেরত দিচ্ছে কি না। এখনো সেই দোকানের দুটো খাতার ভেতর বাকির খাতাটা আমার কাছে রয়ে গেছে। ব্যবসাটা আমি ভালোভাবে চালিয়ে নিচ্ছিলাম। পরে আমি আরেকটা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ি। সারের লাইসেন্স বের করি, যা বাংলাদেশে বের করা খুব কঠিন। এই সারের ব্যবসা করে আমি অনেক উন্নতি করি। এলাকায়ও আয়-উন্নতি হয়। এলাকার মানুষজন এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে, খুশি হয়, আমাকে বেশ খাতির করে।

আমরা তিন ভাই চার বোন। আমি সবার বড়, আমার এক ভাই থাকেন লন্ডনে, তাঁর নাম সুমেল খান। আরেক ভাই থাকেন দেশে, বাবার মতো ব্যবসা করেন। আমরা সবাই ব্যবসায়ী। আমার বিয়ে হয় ২০০১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশে। সেদিন লালাবাজার ইউনিয়ন মাঠে একটা বড় ফুটবল খেলা ছিল। একই দিনে বিয়ে আর খেলা পড়ে গেছিল। বিয়ের পর পারিবারিক কারণে এদেশে আসি। ২১ বছর ধরে নরউইচে আছি। আসবার পর চাকরি করিনি, বাবা ব্যবসা শিখিয়েছেন অল্প বয়সে, আমি ব্যবসাই করেছি ২০ বছর ধরে। আমার ব্যবসা ছিল রোক্সহামে, নাম—রয়্যাল পিজ্জা অ্যান্ড কাবাব। বাঙালিদের ভেতর এই ব্যবসায় আর কেউ আমার আগে আসেনি। ফ্রন্টে ছিল পিজ্জা আর কাবাব, ব্যাকে ছিল ফ্রেশ ইন্ডিয়ান। ব্যবসায় আমি সফল হয়েছি, মাস দুয়েক হয় ব্যবসাটা ছেড়ে দিয়েছি। শহরে আমার কয়েক হাজার কাস্টমার রয়েছে। তাঁরা প্রায়ই আমাকে অনুরোধ করে ফিরে আসবার জন্য, আমিও মিস করি।

কিন্তু ছেলেমেয়েরা এখন একটু বড় হয়েছে, আমি এখন পরিবারে সময় দিতে চাই, আনন্দে থাকতে চাই, বেড়াতে চাই। এ জীবন ক্ষুদ্র জীবন। হয়তো ভবিষ্যতে আবার ব্যবসায় ফিরব, তেমন পরিকল্পনা আছে। বাংলাদেশে এবং এদেশে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে, এরা বেশির ভাগই ব্যবসায়ী, কেউ কেউ রাজনীতিক।

দেশের অনেককিছুই মিস করি, সবচেয়ে মিস করি নিজের মা-বাপ এবং পরিবারের সংসর্গ। সাংস্কৃতিকভাবে যার অভাব বোধ করি, তা আর ফিরে পাব না। ছোটবেলার সূর্যাস্তের সেই সময়টার কথা মনে পড়ে, যখন আমি হয়তো গ্রামের কোনো রাস্তায় অথবা জঙ্গলে হাঁটছি, কোথাও দাওয়াতে যাচ্ছি অথবা খেলতে যাচ্ছি, সেইসব সময় তো আর ফিরে পাব না। মায়ের হাতের রান্না খুব মিস করি, মায়ের সঙ্গে তো কিছুর তুলনা চলে না। তবে মায়ের মতো না রাঁধলেও আমার স্ত্রী শেফা খুব ভালো রান্না করেন। আমি নিজে মূলত পিজ্জা শেফ, তাছাড়াও অন্যান্য রান্না শিখেছি। বাড়িতে স্ত্রী মাঝে মাঝে তাগাদা দেন রান্না করবার জন্য, বলেন—আমার হাতের রান্না মজার। আমিও বলি—আমি রান্না করলে কনুই পর্যন্ত চেটে খাবে এমন মজার রান্না করব! বাগানে সবাই মিলে আমরা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা হিসেবে একত্রে মাটির চুলায় রান্না করে খাই। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে, এটা মুসলমানদের সুন্নতি-খানার সংস্কৃতিও বলতে পারেন, মাটিতে বসে খাওয়াও নবীর সুন্নত, একসঙ্গে সবাই মিলে বসে খাওয়াও নবীর সুন্নত। সারাদিন ধান কেটে, ক্ষেতে পরিশ্রম করে যাঁরা একসঙ্গে খেতেন, তাঁদের মতো। গতবার আমরা যখন এভাবে রান্না করে খেয়েছি আমরা আত্মীয়স্বজন মিলে ৫২ জন ছিলাম, বাইরের কেউই ছিল না।

প্রথম এসে যে নরউইচকে দেখেছি, তার সঙ্গে এখনকার নরউইচের অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। প্রথম যখন এলাম, তখন আমাদের বাড়ির সব রান্না করতেন আমার শাশুড়িমা অর্থাৎ খালা। তাঁরা আমার খাওয়া দেখে বলতেন আমি এমনভাবে খাওয়াদাওয়া করি যেন এখানে অনেকদিন থাকা মানুষ। অনেকেই কিন্তু এখানে এসে এখানকার খাবার মুখে তুলতে পারে না, বিশেষত ভেড়ার মাংসে একটা আলাদা গন্ধ আছে। আমার কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে। তিনি রান্নাও খুব ভালো করতেন। নরউইচে বের হয়ে মনে হতো—এ কেমন জায়গা যেখানে কোনো বাঙালি নেই, কোনো বাঙালি কালচার নেই! মনে মনে ভাবলাম, এ আমি কোথায় এলাম। কালো লোক নেই, নিজের জাতের লোক নেই, কথা বলার মতো লোক নেই। আমার স্ত্রী, তাঁর বড় ভাই শফিক মিয়া আর তাঁর স্ত্রী মিলে আমাকে এ শহরের নামকরা শপিং সেন্টার ক্যাসল মল নিয়ে গেলেন। আমরা চারজন প্রায় তিন-চার ঘন্টা শপিং করলাম, নিজের দেশের একটি মানুষ দেখতে পেলাম না, একটি কালার্ড মানুষ দেখলাম না। আর এখন যেদিকে তাকাই, দেখি আমার দেশী ভাই, দেশী ভাতিজা। আমিও কথা বলি, তারাও আমার সঙ্গে কথা বলে। সেটা বেশ ভালো লাগে। আমার দেশের কত মানুষ এখানে আসতে পেরেছি, আল্লাহ এনেছেন, এসে আমরা সকলে পরিশ্রম করেছি, কিন্তু স্বাধীন জীবন পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি। আমার অন্তরের

ধন্যবাদ জানাই এদেশের রাণীকে আর পার্লামেন্ট সদস্যদের, সারা পৃথিবীর মানুষকে তাঁরা এখানে আইন মেনে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন।